উনিশ শতকে অসম - বাংলা সম্পর্ক

সুভাষ দে

ঃ ‘লুপ্তি, সুপ্তি, বিস্মৃতি, ভয়, ভ্রম, ভাবনা’

‘আন্ধারের বুকু ফালি
পোহরর দেশ পালে
পামগৈ জীবনের অভিনব
অময়া অর্থ’

বঙ্গদেশে রবীন্দ্রনাথের জন্মের চোদ্দ বৎসর আগে (১৮৪৮) অসমের শিবসাগর থেকে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, নাম ‘অণোদই মাসিকপত্র’। যে বৎসর রবীন্দ্রনাথের জন্ম হলো (১৮৬১) সেই বৎসর থেকে পত্রিকাটির নাম বানান পরিবর্তন করে হলো ‘অণোদয়’। পত্রিকাটির আয়ুষ্কাল আটত্রিশ বৎসর (১৮৮৩ সাল পর্যন্ত)। অসমের সাহিত্যের ইতিহাসে এই পর্বটি (১৮৪৬-৮৩) ‘অণোদয় যুগ’ নামে খ্যাত।
আনন্দরাম ঢোকিয়াল ফুকন (১৮২৯০১৮৫৯) ছিলেন এই পত্রিকাটির অন্যতম সহায়কারী, বলা ভালো বিশেষ পৃষ্ঠপোষক। অসমিয়া ভাষার পক্ষে তার স্বাতন্ত্র্য - দৃঢ় রূপটি স্পষ্ট প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অণোদয় যুগে দুটি প্রবল অসুবিধা ছিল---
এক. পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মিশনারিরা সবাই ছিলেন ইংরেজিভাষী।
দুই. পত্রিকার প্রধান লেখকবৃন্দও ছিলেন ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত।
পত্রিকাটিতে এর প্রভাব নানাভাবে পড়েছিল। এ ছাড়া বাংলাভাষার ব্যাপক এবং সর্বত্র প্রচলনের বিষয়টি তো ছিলই। এ - সম্পর্কে একটি উদ্ধৃতি ---‘অসমত বাঙালী ভাষার বর আদর আছিল। মাতৃভাষাক সকলোয়ে ঘিনাইছিল -- ইস্কুলত বাঙ্গালী, কাছারিত বাঙ্গালী, ডেকাবিলাকর আলাপত বাঙ্গালী, আ তেওঁলোকর চিঠিতো বাঙ্গালী ভাষাহে চলিছিল...।’
(‘অণোদই যুগর অসমীয়া ভাষা’। ‘প্রকাশ’। ১৯৮৩, অণোদই সংখ্যা। পৃ ৭৩। ড. উপেন্দ্রনাথ গোস্বামী)
সব মিলিয়ে অসমিয়া ভাষা - সাহিত্যের ইতিহাসে ‘অনোদই’-র ভাষা - সাহিত্যের মূল্য ও গুত্ব অবিস্মরণীয়। এই পত্রিকাটির মাধ্যমে অসমিয়া ভাষা - সাহিত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রয়াস চলছিল, আগেই বলা হয়েছে যে, এতে সত্রিয় সহায়কদের মধ্যে প্রধান ছিলেন আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন। বলা যায়, অণোদয় পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করেই প্রকৃত আধুনিক অসমিয়া ভাষার দৃঢ়ভিত্তি স্থাপিত লো। এই অসামান্য কাজটি সমাধা হওয়ার পেছনে মিশনারিদের অবদান অসাধারণ, কিন্তু সেই কালপর্বে অসমিয়া ভাষার আত্মস্বাতন্ত্র্য এবং একটি নিয়মানুগ ভাষারীতি প্রচলন করার তাগিদের ক্ষেত্রে বাংলাভাষার প্রবল প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়াটাও জরি ছিল। লক্ষণীয় যে এই তাগিদ সর্বান্তঃকরণে উপলব্ধি করেও উনিশ শতকে অনেক বিদগ্ধ অসমিয়াই বাংলা ভাষা চর্চা করেছেন আন্তরিকভাবে। এ - বিষয়ে সত্যতা স্বীকার করেছেন অসমের ভাষা - সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতারা -- ‘আমার দেশত বংগ ভাষা- সাহিত্য প্রচলন নোহোয়াহেঁতেন আ লিখিত

যুবকসকল কলিকতা নথকাহেঁতেন অণোদয় যুগর ভাষা আ সাহিত্যর এনে দ্রুত পরিবর্তন হয়তো ন'হলহেঁতেন। বেজবয়া, রজনীকান্ত বরদলৈ, গোহঞি বয়া আদিয়ে আত্মজীবন প্রসংগত উনবিংশ শতকর শেষাংশর বংগীয় আবহায়াই তেওঁলে াকক কেনেকৈ প্রভাবিত করিছিল উল্লেখ করি গৈছে।' (অসমিয়া সাহিত্যর সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত', শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা)।

আমাদের অন্বিষ্ট 'উনবিংশ শতকের শেষাংশর' সেই 'বংগীয় আবহাওয়া' - টিকে দেখবার এবং সেই বিষয়টির একটি গভীর এবং বিপুল তাৎপর্যের অনুধাবন এবং পুনঃস্মরণ। একটি সম্পূর্ণ শতকে যে সব বিভিন্ন প্রয়াস এ-সম্পর্কে চলছিল, সেই বিশাল আয়োজনেযোগদানকারী হিসেবে এক্ষেত্রে মাত্র দুজন অসমিয়া মনীষীর জীবন ও কর্মকাণ্ডে বাংলার ভূমিকাটি দেখাবার প্রয়াস করা হলো, একজনআনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন এবং অন্যজন আনন্দরাম বয়া।

ভাষা - সাহিত্যে আধুনিকতার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সাময়িক পত্র - পত্রিকা প্রকাশের একটি অনিবার্য যোগসূত্র যেকোনো জা তির সমৃদ্ধির ইতিহাসেই লক্ষণীয় হয়। অসমিয়া সাহিত্য - সংস্কৃতির ইতিহাসও এর ব্যতিত্রম নয়। গোটা উনিশ শতক জুড়ে এই অসমিয়া সাময়িক পত্রিকাগুলির উদ্ভব এবং বিকাশের সঙ্গে বাংলার যোগসূত্রটি নানাদিক থেকেই কৌতূহলজনক। এই সহযোগ যে কত আন্তরিক ছিল, সমস্তই যে তৃতীয় কোনো গোষ্ঠীর সুচিন্তিত চত্রান্তের ফল শুধু নয়, যে সম্পর্কে কিছু তথ্য উল্লেখ করাই যেতে পারে।

১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর মিশনের সৌজন্যে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'দিগ - দর্শন' -ই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। লক্ষণীয় যে, ওই ১৮১৮ সালেই, একমাস পরে, মে মাসে প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রক াশিত হয়। 'সমাচার দর্পণ' - ও ওই শ্রীরামপুর মিশনেরই উদ্যোগে। অসমেও 'অণোদই' পত্রিকা প্রকাশের মূলে ছিলেন মিশনারিররা। অর্থাৎ বাংলা এবং অসমিয়া দুই ভাষারই সংবাদপত্রের জনক 'বিদেশী চাহাব'।

১৮১৮-তে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র, ১৮৪৬-এ প্রথম অসমিয়া সংবাদপত্র। তবে এই মধ্যপর্বে অসমের শিক্ষিতজনের মধ্যে সংবাদপত্রের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন স্পৃহা কেমন বেড়ে চলেছিল; তার একটি প্রমাণ পাওয়া যায় বঙ্গদেশের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদের মাধ্যমে। অসমে প্রথম অসমিয়া ভাষায় অণোদই প্রকাশের প্রায় ১৬ বৎসর পূর্বে। 'অ াসাম থেকে জ্ঞানবৃদ্ধি' শিরোনামের ওই সংবাদটি আংশিক উদ্ধৃত করা যেতে পারে--- 'আসাম দেশ জ্ঞানবৃদ্ধি' শিরোন ামের ওই সংবাদটি আংশিক উদ্ধৃত করা যেতে পারে --- 'আসাম দেশ এইক্ষণে কেবল প্রায় সাত বৎসর হইল ইঙ্গলণ্ডীয়া ধিকারের ব্যাপ্য, অতএব তদ্দেশীয় শিক্ষাবিশিষ্ট মহাশয়েরা যে এই অল্পকালের মধ্যে জ্ঞানান্বেষণে এতাদৃশ কৃতকার্য্য হইয় াছেন ইহাতে আমরা বিস্ময়াপন্ন হইলাম এবং তাহাদের যথার্থ প্রাপ্য এই প্রশংসাবিন্দুতে যদ্যপি তাহারা উদ্যোগসিন্ধুতে ম গ্ন হন তবে আমাদের আরো পরম সন্তোষ জন্মিবে। আসাম দেশীয় অতিমান্য লোকেরা বঙ্গদেশও ও বঙ্গদেশ প্রচলিত ত াবদ্ব্যাপারের সঙ্গে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের দ্বারা সম্পর্ক রাখেন। ঐ আসাম দেশস্থেরা যাদৃশ এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্র গ্রাহক তাদৃশ প্রায় বঙ্গদেশের কোন জিলায় দৃষ্ট হয় না কিন্তু আমাদের কিম্বা অন্য এতদেশীয় সম্বাদপত্র সম্পাদকেরদের নিকটে আসাম দেশ হইতে যে সপ্তাহে প্রেরিত না আইসে এমন সপ্তাহই প্রায় অপ্রসিদ্ধ।' (৩০ জুলাই, ১৮৩১)

লক্ষণীয় যে অসমের লোকেরা যখন 'বঙ্গদেশ প্রচলিত তদদ্ব্যাপারের সঙ্গে' এমন নিবিড় সম্পর্ক রাখেন যা তুলনায় তৎক ালীন বাংলা যে কোনো জেলার তুলনায় অনেক বেশি, এমন মনে করছেন কলকাতার 'সমাচার দর্পণ' -- সেটি ১৮৩১ স াল। 'ইংরেজ এবং বাঙালী আমোলার' চত্রান্তে বাংলাভাষা জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার যে প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত, সেই কিন্তু ঘটবে আরও কয়েক বৎসর পর --- ১৮৩৬সালে। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, হরিরাম ঢেকিয়াল ফুকন তার 'আস াম বুরঞ্জি' প্রথম প্রকাশিত বুরঞ্জী রচনা করে তেতিয়া বঙলা গদ্যর আমা- ডিমা অবস্থা।'

তা ছাড়া কলকাতার বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ -এ যে সব অসমিয়া শিক্ষিতজনেরা লিখতেন সেসব কৃতবিদ্য সার স্বতদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য নাম হলো --- হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন, যজ্ঞরাম খারঘরীয়া ফুকন, কাশীনাথ তামুলী ফুকন, য াদুরাম ডেকা বয়া, মণিরাম দেওয়ান প্রমুখ। (তথ্যসূত্র 'উনবিংশ শতিকার সংবাদপত্র অ আলোচনী', নন্দ তালুকদার)

'অণোদই' অসমে 'বিদেশী চাহাব' - দের প্রকাশিত প্রতিষ্ঠিত প্রথম অসমিয়া সংবাদপত্র। দ্বিতীয় অসমিয়া সংবাদপত্রটির ন াম 'আসাম -- বিলাসিনী' (১৮৭১)। এই সংবাদপত্রটির সঙ্গেও পরোক্ষে বঙ্গদেশের একটি যোগসূত্র রয়েছে। 'আউনীঅ াটী' সত্যের সত্রাধিকার শ্রী সৰী দত্তদের গোস্বামী যে ছাপা মেশিনটিতে পত্রিকাটি ছাপালেন সেই 'ধর্ম্মপ্রকাশ' যন্ত্রটি 'কলিকাতার পরা অনাই আউনী আটী সত্তর পূবদিশে' স্থাপন করা হয়েছিল। 'আসাম বিলাসিনী' পত্রিকার প্রতি সংখ্যার

শেষ পৃষ্টাতে যে ঘোষণাটি মূদ্রিত হতো, লক্ষ করলে দেখা যাবে যে সেই বাক্যবন্ধ বা ভাষারীতি বুঝতে কোনো বাঙালিরই অসুবিদা হবার কথা নয় --- 'এই আসামবিলাসিনী পত্রিকা 'আসাম যোড়হাট অন্তর্গত মোঃ মাজুলী, আউনীআটী সত্রত ধর্ম্মপ্রকাশ যন্ত্রে প্রতিমাসে মুদ্রিত হয়। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১।। (ডেরটাকা)।'

এরপরের বৎসর অর্থাৎ ১৮৭২ সালে প্রথম অসমের দৈনিক পত্রিকা 'আসামমিহির' প্রকাশিত হয়; স্বল্পায়ু এই পত্রিকাটির সঙ্গে বাংলার সম্পর্কটি এই উদ্ধৃটির মাধ্যমেই বোঝা যাবে --- 'ই প্রথমত বঙলাত ওয়াল। পিছত বঙলা - ইংরাজী দ্বিভাষী হয়।' (ঊনবিংশ শতিকার সংবাদপত্র আ আলোচনী'অ, নন্দ তালকুদার)

ভাষা হয়তো বাংলা নয়, কিন্তু সে যুগে অসমের সাময়িকপত্রের ইতিহাসে বঙ্গদেশের সঙ্গে আদান - প্রদানের বিভিন্ন দিক গোপন থাকে না। যে যোগাযোগটি পরে নানা কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তেমন কয়েকটি যোগসূত্র উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ক) 'এই সময় ছোয়াত (১৮৭৫-৭৬) কলিকাতা ছাপা হৈ বিজ্ঞান, সাহিত্য আ ধর্মবিষয়ক দু'খন আলোচনী নগাঁওর পরা প্রকাশ হৈছিল।'

শুধু যোগসূত্র অনুসন্ধানই নয়, একটি প্রাপ্ত তথ্যে অসম থেকে প্রকাশিত বাংলা কাগজের কথা জানা যাচ্ছে।

(খ) '১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দত গোয়ালপারা হিতসাধিনী নামর এখন সাদিনীয়া কাকত গোয়ালপারার পরা প্রকাশ হয়। ১৮৮২ সালে। এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। এই কাগজটির সঙ্গে জড়িত একজন বঙ্গসন্তানের নাম পাচ্ছি -- 'অভয়শঙ্কর গুহ আছিল 'আসাম নিউচর'সহকারী সম্পাদক।'

'আসাম বন্ধু' নামে আর একটি পত্রিকার কথা জানা যাচ্ছে। এটি--

(গ) 'ছা হৈছিল কলিকাতা বিভিন্ন ছপাশালতা।'

'অণোদই' পত্রিকাই শুধু নয়, অসমিয়া সাহিত্যে অপর একটি যুগবিভাগ স্বীকৃত হয়েছে অপর একটি পত্রিকার নামেও। 'জোনাকী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে 'জোনাকী যুগ'। এই প্রসঙ্গে বঙ্গদেশের সঙ্গে যোগাযোগের একটি তথ্য রয়েছে। 'জোনাকী' পত্রিকা প্রথম পরিকল্পিত এবং প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে। এ - বিষয়ে জানা যাচ্ছে যে --- 'জোনাকী আলোচনী প্রকাশর গুরিত আছিল অসমীয়া ভাষা উন্নতিসাধিনী সভা অ সভার গুরি ধরোঁতা এ চাম কলিকতীয়া ছাত্র। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দর ২৫ আগষ্টত কলিকাতা ৬৭ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটর অসমীয়া ছাত্রর মেচতে অসমীয়া ভাষার উন্নতি সাধিনী সভার জন্ম। জন্মলগ্নরে পরা সভাই মুখপত্র স্বরূপে এখন আলোচনী উলিয়াবলৈদৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করিছিল...চন্দ্রকুমার আগরয়ালা...তেতিয়া কলিকাতা প্রেছিদেন্সী কলেজর ছাত্র।'

চন্দ্রকুমার আগরওয়ালাই হলেন 'জোনাকী'-র প্রথম প্রকাশ - সম্পাদক তিনি একটি শর্ত আরোপ করেছিলেন, পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সভ্যদের প্রতি, যেটি অত্যন্ত কৌতুকময় এবং নানাদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বললেন যে এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত সবাইকে কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি কিছু - না - কিছু লিখতেই হবে, না লিখলে ১৫ টাকা জরিমানা। ১৫টাকা দেওয়ার ভয়ে সবাই কিছু না কিছু লিখতে থাকলেন। প্রথম প্রকাশের পরে 'জোনাকী' পত্রিকা সাত বৎসর চলার পরে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর পুনঃপ্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে --- এর পরে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' - এর কথা। দ্বিতীয় পর্যায়ে 'জোনাকী' পত্রিকা অবশ্য আর কলকাতা থেকে নয়, গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত হতে লাগল। এজন্য এখনও ওই পত্রিকা প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা হলে 'কলিকতীয়া জোনাকী' এবং 'গুয়াহাটির জোনাকী' -- এই দুটি স্বতন্ত্র নাম উচচারিত হয়ে থাকে।

এবার একটু অন্যদিক থেকে বিষয়টিকে দেখা যেতে পারে, অর্থাৎ উনিশ শতকেরই অসমিয়াদের এই শিল্প - সাহিত্য - সংস্কৃতি চর্চা তথা বাংলা অধ্যয়ন ও লেখন কলকাতায় কেমনভাবে গৃহীত হয়েছিল! একটি উদাহরণের কথাই বলি। উনিশ শতকের সেই কলকাতার একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতে ১৮৮৫-র ১৩ জুনের বর্ণনায় পাই--- 'শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের সেই পূর্ব পরিচিত ঘরে বিশ্রাম করছেন। আজ শনিবার ১৩ই জুন, ১৮৮৫ জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি, শুক্ল প্রতিপদ। বেলা তিনটা।

পণ্ডিতজি মেঝের পরে মাদুরে বসে আছেন। একটি শোকাতুরা ব্রাহ্মণী ঘরের উত্তরের দরজার পাশে দাড়িয়ে আছেন।

কিশোরী আছেন। মাস্টার এসে প্রণাম করলেন। সঙ্গে দ্বিজ প্রভৃতি। অখিলবাবুর প্রতিবেশীও বসে আছেন। তাঁর সঙ্গে একটি অসমীয়া ছোক্‌রা।'

উনিশ শতকের সেই কলকাতায় শুধু অসম নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেরই একটি যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে একজন সমাজতাত্ত্বিকের বিশ্লেষণ এই রকম 'ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষের প্রতিটি অঞ্চলের নরনারী।...উনিশ আর বিশ ---এই দুই শতকের ভারতবর্ষের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে যে সব আলোড়ন এবং আন্দোলন দেখা গিয়েছিল তার প্রত্যেকটির সূচনা কলকাতাকে কেন্দ্র করে।' (নিশীথরঞ্জন রায় 'রামকৃষ্ণ - বিবেকানন্দের সমকালীন কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা')

'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'-এ বর্ণিত নামপরিচয়হীন ওই 'অসমীয়া ছোক্‌রা' - টিকে আমরা অসমের সমকালীন নবজাগ্রত মনীষাসম্পন্নদের প্রতিনিধি বলে ধরে নিতে পারি, এবং উনিশ শতকে অসমিয়া - বাঙালি সম্পর্কের একটি উজ্জ্বল ঘটনা বলেই-বা বলতে বাধা কোথায়! এই যোগসূত্র প্রথমে গড়ে উঠেছিল একটি বহিরঙ্গের বৈষয়িক প্রয়োজনের সূত্র ধরে --- পরে তা আত্মিক সম্পর্কের একটি উজ্জ্বল ঘটনা বলেই - বা বলতে বাধা কোথায়! এই যোগসূত্র প্রথমে গড়ে উঠেছিল একটি বহিরঙ্গের বৈষয়িক প্রয়োজনের সূত্র ধরে -- পরে তা আত্মিক সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়েছিল একটি বহিরঙ্গের বৈষয়িক প্রয়োজনের সূত্র ধরে -- পরে তা আত্মিক সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়েছিল অনেক ক্ষেত্রেই। এই সম্পর্কেও নিশীথরঞ্জন রায়ের বিশ্লেষণটি মনে করতে পারি---- '...১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের সংখ্যা বাড়ছিল। ... ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মানুষদের ক্রম - বর্ধমান ভিড় এখানকার জনসমাজের চেহারা দ্রুতগতিতে পালটে দিতে শু করেছিল। কলকাতায় গড়ে উঠেছিল এক মিশ্রসমাজ। বহু ভাষাভাষী মানুষের এক মিলনক্ষেত্র। একই নগরের অধিবাসী---এই পরিচয়টুকুই ছিল তাদের পরস্পরকে এক সূত্রে ধরে রাখার উপাদান, এককথায় Urban বা শহুরে মানসিকতা।'

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের অনেক (১৮৩৬) আগে থেকেই অসম এবং কামাখ্যাতীর্থ প্রসঙ্গে একজন অসমিয়া বিদগ্ধ পুষ রচনা করেছিলেন 'কামাখ্যা যাত্রাপদ্ধতি' নামে একটি বই। রচয়িতা আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন। কামাখ্যাতীর্থ ভ্রমণে যাঁরা আসবেন তাঁদের আগমন পথের গতি নির্দেশ প্রসঙ্গে এটি একটি মূল্যবান প্রয়োজনীয় বই। এটি বিনামূল্যে বিতরণ করা হতো -- সে সময়ে বাংলায় কোনো তীর্থদর্শনের ভ্রমণপথের বর্ণনা দিয়ে বই রচিত হয়েছিল কি না সঠিক জানি না। যাক সে কথা, আবার স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে ফিরে আসি। তিনি তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি.এ.। বৈষ্ণবচরণ বসাককে সঙ্গে নিয়ে ১৮৮৭-তে তিনি একটি বাংলা সংগীত সংকলন গ্রন্থ সম্পাদনা করেন, নাম -- 'সঙ্গীত কল্পত'। সেই বাংলা সংগীত সংকলন গ্রন্থে রয়েছে দুটি অসমিয়া গান। গান দুটির শিরোনামে লেখা রয়েছে 'আসাম ছাত্রসভা'-র বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে রচিত গীত।

এই 'আসাম ছাত্রসভা' -র ইতিহাসটি একটু দেখা যেতে পারে। বিবেকানন্দ সম্পাদিত সংগীত সংকলন গ্রন্থে শিরোনামটি একটু বদলে গিয়েছে মনে হয়। কেননা ওই পর্বে অসম থেকে যেসব ছাত্ররা কলকাতায় পড়তে গিয়েছিলেন তাঁদের যে উল্লেখযোগ্য সংগঠনটির কথা জানা যাচ্ছে সেটির নাম 'অসমীয়া সাহিত্য সভা' বা 'অসমীয়া ছাত্র সাহিত্য সভা'। এই সংগঠনটি সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পাচ্ছি উষারঞ্জন ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাথ অ অসম' বইয়ে। তিনি বলেছেন ---'কলিকতা পড়াশুনা করি থাকোতে কেউবাগরাকী অসমীয়া যুবকে ১৮৭২ চনত 'অসমীয়া সাহিত্যসভা' বা 'অসমীয়া ছাত্রর সাহিত্যসভা' প্রতিষ্ঠা করে। সময়টো মন করিব লগিয়া, অসমীয়া ভাষা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হেয়ার এ বছর আগতে। গঙ্গাগোবিন্দ ফুকন, জগন্নাথ বয়া আ মানিকচন্দ্র বয়া আদি সকলেই প্রধানতঃ এই অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাপক আছিল।... শভা সমিতি পতা হৈছিল, অসমীয়া ছাত্র সকলর মেছত, অর্থাৎ ৬৭ মির্জাপুর ষ্ট্রিট, ১৪ প্রতাপচন্দ্র চেটার্জি লেন,৬২ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রিট আ ২ ভবানী দত্ত লেনতা। বুধবরীয়া সভা আসছিল এক প্রকার তুলুঙ্গা মেজাজর। প্রতি শনিবারের আলোচনা হৈছিল ভাষা সাহিত্য আ গধুর বিষয় সম্পর্কে।'

'সঙ্গীত কল্পত' সংগীত সংকলনটি রচনাকালে বোঝা যায়, কলকাতায় বসবাসকারী অসমিয়া ছাত্রেরা উনিশ শতকের সেই পর্বে তাঁদের বিদ্যানুরাগ, সপ্রতিভতা, নানা বিষয়ে আগ্রহ - উৎসাহ সব মিলিয়ে সমসাময়িক কলকাতার বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের একনিষ্ঠ সাহিত্যচর্চা, মাতৃভাষার প্রতি টান অপর সম্প্রদায়েরর

শিক্ষিত ব্যক্তি এবং ছাত্র সমাজকে আকর্ষিত করেছিল। এসব মিলিয়ে উনিশ শতকে অসম-বাংলা সম্পর্কের মধ্যে এক উদার আকাশের মুক্তি যে ছিল, সে বিষয়েও অভিনিবেশ দৃঢ় হয়। সেই পর্বে নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ., পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ এবং বৈষ্ণবচরণ বসাক তাঁদের সংগীত সংকলন গ্রন্থে অসমিয়া ছাত্রদের সংগঠনের বাৎসরিক উৎসবে গীত দুটি গানকে সাগ্রহে স্থান দিচ্ছেন।

সে সময়ে কলকাতায় অধ্যয়নরত অসমিয়া যুবকদের বাংলা ও অসমের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান সম্পর্কে অসমিয়া সাহিত্যের ইতিহাসেও স্বীকৃতি রয়েছে--- 'হেমচন্দ্র গুণাভিরামর অভ্যুদয়র কালছোয়াতে ইংরাজী শিক্ষার পেহর পোয়া দুই - চারিজন অসমীয়া ডেকাই ভাষাজননীর সেবাত আত্মনিয়োগ করছিল। এফালে যেনেকৈ ইংরাজী শিক্ষা আ সাহিত্যর লগত এওঁলোকর পরিচয় ঘটিছিল, আনফালে বঙলা সাহিত্যর সংস্পর্শটো এওঁলোকে নাহাকৈ থকা নাছিল। অসমত বাংলা ভাষা প্রবর্তনর ফলতে হওক, নাইবা কলিকতাত উচচশিক্ষা লাভ করিবলৈ যোয়ার ফলতেই হওক বঙলা সাহিত্য অধ্যয়ন করার সুবিধা এওঁলোকে লাভ করিছিল। এই দ্বৈত প্রভাব দ্বারা উদ্বুদ্ধ হৈ শিক্ষিত ডেকাসলকে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য রচনা করিবলৈ প্রয়াস করে।' ('অসমিয়া সাহিত্যর সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত', শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ শর্মা)

স্বামী বিবেকানন্দ অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথ দত্ত নামে তৎকালীন কলকাতার উজ্জ্বলতম যুবকটির সঙ্গে কোনো - না - কোনোভাবে অসমীয় ছাত্রদের, যাঁরা পরবর্তীকালে সবাই অসমের বরেণ্য পুষ, তাঁদের যোগাযোগ হয়ে থাকবে। অন্তত সংগীতের সূত্রে তো বটেই। কেননা তখনকার কলকাতার ব্রাহ্মসমাজকেন্দ্রিক যে সংস্কৃতি আবহ সেখানে 'নরেন্দ্রর মতো গাইতে বাজাতে কেউ পারে না' (শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত)। কাজেই সংগীতের সূত্রেই হয়তো সে সময়কার কলকাতার অসমিয়া ছাত্রসমাজের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ দত্তের কোনো যোগসূত্র গড়ে উঠে থাকবে। বাংলা ও অসমের সাংগীতিক ক্ষেত্রের এই রকম কোনো আদানপ্রদানের, প্রাণনা - অনুপ্রেরণার তথ্যানুসন্ধানী ইতিহাস এখনও অপেক্ষিত। এ - বিষয়ে যোগ্য অনুসন্ধান এবং গবেষণা হলে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। নিজের ভাষা - সংস্কৃতির প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধান্বিত থেকেও কী ভাবে সমসাময়িক পরিমণ্ডলের গ্রহণযোগ্য উপাদান দিয়ে নিজের সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করা যায় -- এ - ব্যাপারেসংগীতসৃষ্টি এবং চর্চাও যে দূরে থাকেনি --- এই বিষয়টির যোগ্য বিশ্লেষণ হয়তো অনেক পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাবে বলেই বিশ্বাস।

প্রসঙ্গত 'সঙ্গীত কল্পত' গ্রন্থের 'আসাম ছাত্র সভার বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে শিরোনামে যে দুটি অসমিয়া গান সংকলিত করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ, সে দুটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে---

(ক) রাগিনী ঝিঁঝিট -- তান একতাল

কি সুখর দিন আজি, কেনে প্রতিভাব এ,
আনন্দে নধরে হিয়া সকলো ভাই বন্ধুর এ।
ঈশ্বরর কৃপাগুণে, আহি সবে জনে জনে,
প্রাণভরি মহারঙ্গে করিছো উৎসব এ।
বছরে বছরে যেন হয় এনে সুমিলন,
আহি যেন সবে পুন সুকার্য্য সাধয় এ।।

(খ) রাগিনী বাগেশ্রী কানাড়া --তাল আড়াঠেকা

কণা বিতরি প্রভু, দিয়া শান্তিপদছায়া,
মঙ্গল মলয় আনি, করা শুদ্ধ পাপ হিয়া।
দিয়া জ্ঞান শুভমতি, কাকুতি করিছে অতি,
সংসার অরণ্যে আজি, সুপথ দেখুয়াই দিয়া,
আমার উদ্দেশ ত, কুশলে বাখিবা হরি,
তোমার কৃপাত যেন, দিয়ে তার বাড়ে কায়া।।

এই গানদুটির রচয়িতা হিসেবে কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি। 'প্রাসঙ্গিক তথ্য আলোচনা' অংশে গীতিকারদের নামের স্থ

ানে লেখা আছে 'অজ্ঞাত' (সঙ্গীত কল্পত, পৃ ২৮৪-২৮৫)। মূল কথাটি হলো সে পর্বে অসম - বাংলা সম্পর্কটির একটি দিক বিবেকানন্দের অসমের সঙ্গে এই যোগাযোগটি এখনও অনুদ্‌ঘাটিত। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ পর্বে নগর কলকাতায় নরেন্দ্রনাথ দত্তের মতো যুবক অসমের উজ্জ্বল মেধাসম্পন্ন যুবকদের সঙ্গে নিবিড় সখ্য - শ্রদ্ধা - সান্নিধ্যে হয়তো লাভ করেছিলেন পরম প্রীতি ও প্রেরণা, তারই ফলশ্রুতি তাঁর সম্পাদিত গীত সংকলনে 'অসম ছাত্রসভার ব াৎসরিক অধিবেশনে' গীত দুটি অসমিয়া গানে অন্তর্ভুক্তি!

।।খ ।।

'আন্ধারক জিনিবলৈ'/ জনতার সমর/ প্রথম ণুয়া দল হৈ/লৈ ব'ল জনতাক/ পোহরলৈ পোহরলৈ।'

আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের জীবনী আলোচনা করে কয়েকটি বিশেষ - বিশেষ ঘটনা তুলে ধরে উনিশ শতকের সেই পর্বে একজন অসমিয়া মহাত্মার বঙ্গদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এবং মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে বলেই বিশ্বাস। এই প্রসঙ্গে উৎস হলো গুণাভিরাম বয়া প্রণীত 'আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনর জীবন চরিত্র' (অসম প্রকাশন পরিষদ, ২য় সংস্করণ - সেপ্টেম্বর, ১৯৯২)। বইটির প্রথম প্রকাশনার সময় প্রুফ দেখে দিয়েছিলেন লক্ষ্মীনাথ বেজবয়া। বর্তমান বইটি ১৯১৫ স ালে প্রকাশিত মূল জীবনী গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ। আলোচ্য বইটির বর্তমান সংস্করণের ভূমিকায় আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের ম াহাত্ম্য সম্পর্কে শ্রী চন্দ্রপ্রসাদ শইকিয়া বলেছেন, '...বৃটিছ শাসন সেই দুর্যোগপূর্ণ কালছোয়াত অসমর অফিচ-কাছারী - আদালত - স্কুল আদিত চলছিল ইংরাজী আ বঙলা ভাষা, অসমতে জন্মগ্রহণ করি অসমীয়াই ক'ব লগা হৈছিল নিজ ম াতৃভাষা অসমীয়ার পরিবর্তে বঙলা ভাষা, সকলো সা-সুবিধার পরা অসমীয়া হৈছিল বঞ্চিত, লাঞ্ছিত আ নির্যাতিত। দদুপরি অসমর অসমীয়া ভাষাকো বঙলা ভাষারেই অপভ্রুংশ বুলি দেখুয়াবলৈ চেষ্টা করা হৈছিল। অসমীয়া জাতির অধ্যবসায়, পাণ্ডিত্য আ বুদ্ধিমত্তারে অসমীয়া ভাষাক পুনর্জ্জীবিত করি জাতীয় স্বার্থর হকে নিজর জীবন উৎসর্গ করি চিরদিন লৈ নিজর নাম অসমীয়া জাতি আ সাহিত্যর বুরঞ্জীত অমর করি থৈ গৈছে।'

পিতা হরিরাম ঢেকিয়াল ফুকন, মাতা প্রসূতী দেবী। তাঁদের পুত্র আনন্দরামের অন্য একটি নাম ছিল হেমকণ্ঠ। আনন্দর ামের বংশের পূর্বপুষদের সঙ্গে বঙ্গদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। আনন্দরামের কাকা যজ্ঞরাম সে যুগে কলকাতায় গিয়ে রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্মের প্রথম প্রবর্তনার কালে ভীষণভাবে প্রভাবিত হন। এ- প্রসঙ্গে আনন্দর াম ঢেকিয়াল ফুকনের জীবনীতে বলা হয়েছে --- 'রামমোহন রায় ব্রাহ্ম, যজ্ঞরাম তেওঁক ছাত্র হোয়াত তেওঁ যে ব্র াহ্মধর্মের প্রথম প্রথম প্রবর্তনার কালে ভীষণভাবে প্রভাবিত হন। 'রামমোহন রায় ব্রাহ্ম, যজ্ঞরাম তেওঁক ছাত্র হোয়াত তেওঁ যে ব্রাহ্ম হ'ল এই জনরব হ'ল। ...হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনে নিজ ভ্রাতৃক ধর্মত্যাগর কথা শুনি তেওঁক আনিবলৈ কলিকত ালৈ যাবলৈ ইচ্ছা করিলে।...হলিরাম ফুকন কলিকতালৈ গ'ল...তেতিয়া অসম দেশ আ কামরূপ কামাখ্যার নাম সেই ক ালে অপ্রচলিত আছিল। লোকে ডাকিনী যোগিনীর দেশ বুলিছিল। হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনে যোগিনী তন্ত্র, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থর পরা সঙ্কলিত করি 'কামাখ্যা যাত্রা পদ্ধতি' নামে এখনি সংস্কৃত গ্রন্থ করে। ...ফুকনে আসাম বুরঞ্জী নামে বঙ্গল া ভাষাত এখনি অসম দেশের নানা বিবরণ আ রজাবিলাকর ইতিহাসঘটিত পুথি রচনা করে। ১৭৫৩ শকত এই দুই পুস্তক কলিকাতার সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রত ছপপা হলয়।... এওঁর নাম কলিকাত বরকৈ প্রকাশ হ'ল। কোনো এজনে তার কে ানো সংবাদপত্রত তেওঁর ওপরত নাম কৌতুক করি 'মুষলীরাম ঢেঁকী কলিকাতায় আসিয়াছে' এইরূপ লেখিছিল। ...ফুকনে এইবিলাক কৌতুকত বর কৌতুকী হৈছিল।... কলিকাতা এওঁক আসামর রজা বুলি লোকে অনুমান করিছিল।' --- -এইরকম আরও বহুবিচিত্র তথ্য জানা যায়, অন্তত উনিশ শতকে অসমের সঙ্গে বহুদেশের নানারকম যোগাযোগ সূত্রে বহুবিধ তথের মধ্যে ঢেকিয়াল ফুকনদের পরিবারের ইতিহাসটুকুই কৌতূহলজনক। পাঁচ বছর বয়সে আনন্দরামের পড়াশে ানা শু হয়। সংস্কৃত ভাষা লেখার সঙ্গে - সঙ্গে 'এওঁবিলাকে সময়ে সময়ে বঙ্গলাভাষাও লেখিবলৈ ও পঢ়িবলৈ ধরিলে।' ১৮৩৫ সালে গুয়াহাটিতে একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল সরকারি সাহায্যে স্থাপিত হয়, তাতে যজ্ঞরামের একটি বিশাল অঙ্কের অর্থসাহায্য ছিল। আনন্দরাম ১৮৩৭ সালে সেই ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন। আনন্দরামের সঙ্গে দুর্গার ামও সেই স্কুলে পড়ে।, দুজনের বুদ্ধিমত্তা, স্বভাবসৌন্দর্য, বিদ্যাস্পৃহা দেখে 'জেনকিনচ্ চাহাব' প্রমুখ অন্যান্য সাহেবরা এদের কলকাতায় শিক্ষাগ্রহণের জন্য পাঠানো উচিত বলে বিবেচনা করলেন। সেই সময় অসম থেকে কলকাতা যাওয়া

এত সহজ ছিল না--- একমাত্র পথ নৌকাযোগে জলপথ '---এতিযার দরে বঙ্গালী মানুহর সিমান গমনাগমন ইয়ালৈ না ছিল। উভয় দেশর মানুহে উভয় দেশয় অবস্থা ভালকে একো নাজানিছিল।' সবার বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। ১৮৪১ সালের বর্ষায় এই দুজন বালক সমারোহ সহকারে কলকাতা অভিমুখে নৌকাযাত্রা করলেন। অসমের এই সাহেব দুজন কলকাতার 'কেলভিশ কোম্পানি', 'কেন্টর কোম্পানি', 'কেরগসন কোম্পানি', ডক্টর মৌয়াট, হেলিডে, বেকেট প্রমুখ কলকাতার মান্যগণ্য লোকেদের কাছে হাতচিঠি দিয়ে দিলেন, এমন - কী প্রয়োজনমতো আর্থিক সাহায্যও যেন এঁদের কাছে পাওয়া যায় সে -- ব্যবস্থাও করে দিলেন।

ঢাকা - সুন্দরবন হয়ে জলপথে তাঁরা পঁচিশ দিনে কলকাতায় পদার্পণ করলেন। ইংরাজ সাহেবদের লেখা সুপারিশপত্রের জোরে হিন্দুকলেজের 'জুনিয়র ডিপার্টমেন্ট' -এর তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হলেন তাঁরা। আনন্দরাম সে-সময়ে কলকাতার যে - সব সভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন --- দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, প্রসন্নকুমারস ঠাকুর, মতিলাল শীল, অক্ষুর দত্ত, রামকমল সেন, সত্যচরণ ঘোষাল, রসময় দত্ত, মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধব দত্ত প্রমুখ। আনন্দরামেরা কলকাতায় যাওয়ার (১৮৪১) আগে থেকেই কলকাতা হুগলি প্রভৃতি জায়গায় অসময়ে যে সব ছাত্রেরা ছিলেন, তাঁরা এঁদের পেয়ে বড় আনন্দিত হলেন। সে - সময়ে কলকাতা থেকে গুয়াহাটিতে চিঠি আসতে বারোদিন লাগত, এ ছাড়াও জলবায়ুর তারতম্যঘটিত নানা রোগ ইত্যাদির জন্য 'কলিকাতলৈ আমার দেশর লোকসকলর বর ভয় আছিল।' আনন্দরামের সঙ্গী-ভ্রাতা দুর্গারাম ফুকনের কলকাতায় মৃত্যু হলো (১৮৪২)। ফুকন একলা হয়ে পড়লেন। সামনে একটি ঘর ভাড়া করে থাকতে লাগলেন, আগে তাঁর রাঁধুনি ছিল অসমিয়া কিন্তু এখন থেকে আনন্দরাম 'বঙ্গালী ব্রাহ্মণ এজন রান্ধনি রাখিলে।' কলকাতায় আনন্দরামের সহপাঠী এবং বাঙ্গালি বন্দুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পটুয়াটোলার শামচরণ দাস কর্মকার, সীতানাথ ঘোষ, শিবদাস দত্ত প্রমুখ। 'আনন্দরাম ফুকনে সুন্দরকৈ বঙ্গলাকথা ক'ব পারিছিল। ইয়ার কারণ তেওঁর বঙ্গালী লোকে সৈতে কথা - বার্তা কোয়াত অকনো অসুবিধা নহৈছিল।' ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত আনন্দরাম কলকাতায় ছিলেন, পড়াশোনা করেছিলেন। এরপর তিনি অসমে ফিরে এলেন। আসার আগে 'দেশলৈ আহিবলগীয়া হোয়াত কিতাপ, মেজ, মাচীয়া, আলমারী, কৌচ, গালিচা, সত্রঞ্চি, কাপোর, পাল্কী আ আন আন অনেক বস্তু ফুকনে কনিলে।'

জলপথে অসমে আসার সময় ফুকন বাংলাদশের অনুপম গ্রাম্যশোভা দেখে মোহিত হয়েছিলেন। সে যা হোক, ততদিনে চাল - চলন, শিক্ষা - দীক্ষা, চিতে ফুকন অনেকটাই অন্যরকম তাঁর সাজসজ্জাও বদলে গিয়েছিল। তিনি যখন অসমে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেন তখন তাঁর পরনে 'শান্তিপুরীয়া কলকিনারী ধুতি, মির্জাই চোলা, গত এখন চাল আ ভরিত মোজা জোতা পিন্ধিছিল...' শুধু কি নিজের সাজসজ্জা? বইয়ের আলমারি, ঢালা বিছানা - বালিশ, টেবিল, কৌচ এসব দিয়ে তিনি যেভাবে ঘর সাজালেন 'তেওঁ যেনে প্রণালীরে ঘরর বস্তু সজাই থলে সেইটো গায়াহাটীত দেশীয় লোকর পক্ষে প্রথম।' ফুকন বহুদিন কলকাতায় ছিলেন। অসমের মানুষের কাছে কলকাতা 'তেতিয়ার দিনর লোক সকলর মতে কলিকাতাই এতিয়ার দিনর মানুহর পক্ষে বিলাত যেনে তেনে আছিল।' সুতরাং দলে- দলে লোক দিনরাত ফুকনের কাছে কলকাতার 'বিবরণ' শুনতে আসতেন। ফুকনও কলকাতার প্রসঙ্গ আলোচনায় ছিলেন অবিশ্রাম। প্রায়ই কলকাতা প্রসঙ্গে কথা উঠলে বলতেন---- 'দেখা হ'লে তোমালোকর এ হাতলৈ চকু ওলাল'হেতেন।'

এরপর আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন বিবাহিত হলেন। বাংলা ভাষা, বাংলাদেশের সঙ্গে যাঁর যোগাযোগ এত দৃঢ় তিনি কিন্তু অসমিয়া ভাষার প্রকৃত মঙ্গলচিন্তক এবং পরিত্রাতার ভূমিকাতেও যথেষ্ট দৃঢ় এবং সঠিক কর্তব্যপালন করেছিলেন। আগেই বলেছি, ১৮৪৬ সালে 'অরণোদই' প্রকাশিত হয়। ফুকন নানা সময়ে এই পত্রিকায় রচনাদি প্রকাশ করতেন। সে-সময় পর্যন্ত অসমিয় ভাষাই এদেশে প্রধান অবলম্বিত ভাষা ছিল। এরপর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে বাংলা ভাষা সমস্ত ব্যাপারে ব্যবহৃত হতে শু হয়। তখন 'আদালত আ লোকর অবস্থা দেখি অসমীয়া ভাষা চলাবর নিমিত্তে ফুকনর যত্ন হ'ল। ...'অসমীয়া লরার মিত্র' নামে দুই কাণ্ড পুস্তক ফুকনে অসমীয়াত প্রচার করিলে।' বইটি কলকাতার 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রেস থেকে ছাপা হওয়ার সময় দেখা গেল প্রেসের বাঙালি কর্মচারীরা অসমিয়া ভাষা ঠিকমতো বোঝেন না, তখন ফুকন কীর্তিকান্ত বয়া নামে একজনকে কলকাতায় পাঠিয়ে বইয়ের কাজ শেষ করলেন। 'অসমীয়া বাষার প্রতি তেওঁর যিমান যত্ন আ আগ্রহ আছিল তাক লেখা বাহুল্য।...ভাষা বিষয়ে সপক্ষবাদী বিপক্ষবাদী সকলোরে সৈতে তেওঁ তর্ক করিছিল।...অ

ানন্দরাম ফুকনর নাম এইবাবে অসমীয়া ভাষার সৈতে তার উন্নতি বা অবনিত হলেও চিরকাল লগ লাগি থাকিব।'
আনন্দরাম বয়া যখন সাব - অ্যাসিসট্যান্ট পদের জন্য পরীক্ষা দিয়েছিলেন, সেই পরীক্ষাতেও নানাবিধ বিষয় ছিল --- ত ার মধ্যে কয়েকটি বাংলার সঙ্গে সম্পর্ক যুত্ত। সেগুলি এইরকম---
'ক/ বঙ্গলা দরখাস্ত ইংরাজিত তরজমা।
খ/ কমিচনার চাহাবর প্রেরিত এখন ইংরাজী চিঠির বঙ্গলা তরজমা।
গ/ বঙ্গদেশর প্রচলিত ফৌজদারী দেওয়ানী আ রাজস্বর আইন ও আসাম কায়দাবন্দীর পরা দিয়া প্রশ্নর উত্তর লিখা' --- ইত্যাদি। এই সমস্ত পরীক্ষাতেই আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ১৮৫১ সালে ৪সেপ্টেম্ বর। সঙ্গে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত গুণাভিরাম বয়া এবং 'প্রসন্নকুমার রায়' নামে একজন বাঙ্গালী লোক।' কলকাতায় আনন্দরাম ফুকন সুপ্রিম কোর্ট, সদর দেওয়ানি, নিজাম আদালত, আলিপুরের কাছারি, পুলিশ অফিস, ছোট আদালত প্রভৃতি জায়গায় বিচার ব্যবস্থার অনেক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সে- সময়কার ইংরেজরা অ াছেই, বাঙালি যেসব মহোদয়দের সঙ্গে আনন্দরাম ঢেকিযাল ফুকনের রীতিমতো হৃদ্যতা ছিল, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বলি --- রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোবিন্দচন্দ্র সেন, মাধবচন্দ্র সেন, শিবদাস দত্ত, আনন্দ দত্ত, প্যারিচাঁদ মিত্র, গোপীকৃষ্ণ মিত্র, মতিলাল শীল, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ। এই পর্যায়ে ফুকন স াত মাস কলকাতায় ছিলেন। ফিরে আসার পথে তিনি বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, চট্টগ্র াম, ঢাকা দেখে এসেছিলেন।
উনিশ শতকের বাংলা - অসম সম্পর্ক সূত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য জানতে পারি যে, শুধু আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনই নন, তাঁর স্ত্রী মাহিন্দ্রী ফুকননী --- 'তেওঁ সুন্দরকৈ লিখিব আ পঢ়িব জানিছিল। বঙ্গলা আ অসমীয়া পুস্তক সুন্দরকৈ বুজিছিল।' উনিশ শতকের সেই পর্বে অসমের একজন গৃহবধূর বাংলাভাষা চর্চা। তখনকার অসমের ভাষাগত পরিবেশটি কেমন ছিল এবং তাতে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের অবদানই বা কেমন ছিল, সে - চিত্র পাওয়া যাবে এই বর্ণনায় --- 'তেতিয়াও অসম দেশত স্কুল আ কাছারীত বঙ্গলা ভাষা চলিছিল। পাদ্রী সকলে অসমীয়া ভাষা চলাবলৈ বর যত্ন করিছিল। ব্রনসন পাদ্রী সাহাবে অসমীয়া ভাষা চলাবলৈ এক আবেদনপত্র প্রস্তুত করে। ফুকনে সেই সাহাবক এই বিষয়ে অনেক সাহায্য করিছিল। ফুকন বিনে দেশীয় লোকর মাজত দেশীয় লোকর হৈদুআষার কথা কয় বা কোনো আলোচনা করে বা বুদ্ধি দিয়ে তেতিয়া এনে লোক নাছিল। দেশীয় যি সকল লোক আছিল সেই সকলোরে বঙ্গলা দেশের নদীয়া শা ন্তিপুর বা কনৌজপুরর পরা অহা বুলি অভিমান করিছিল। অসমীয়া ভাষাই চলক বা বঙ্গলাভাষাই চলক কারো কোনো ধ ার নাখাইছিল। পাদ্রী সাহাব সকলে যত্ন করিছিল তারপর বিফল ফল নদর্শিল। পাছে ফুকনে পাদ্রী সাহাবসকলক আ প াদ্রী সাহাববসকলে ফুকনক দেশীয় ভাষা বিষয়ে সাহায্য করাত উভয়ে এই ভাষার বিশেষ যত্ন করিবলৈ ধরিলে।'
এমনি আরও অনেক প্রসঙ্গ। এই একজনের জীবন আলোচনা করলেই দেখা যায় যে অসম - বাংলা বিভেদ - বিদ্বেষ ইত্যা দি কথাগুলি কত অর্থহীন। ১৮৫৯ সালের ১৬ জুন, রবীন্দ্রনাথের জন্মের দুবছর আগে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন পরলো াক গমন করেন। তাঁর ব্যবহার - চরিত্র - শিক্ষায় বাঙালিদের প্রতি যে মনোভাব সে - সময়ে আন্তরিক প্রকাশিত হয়েছিল সে - বিষয়ে কয়েকটি তথ্য শেষে উদ্ধৃত করি---
১/ আনন্দরামের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে চিঠি দিয়েছিলেন তাঁর অনেক 'বাঙ্গালী' বন্ধুজন।
২/ কলকাতার বেশ কয়েকটি সংবাদপত্রে তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল।
৩/ 'বিজয়া দশমীর দিনা বঙ্গালী আমোলা আ দেশীয় কোনো লোক গধূলি তেওঁর ঘরলৈ সাক্ষাৎ করিবলৈ যায়। সেই সকলর সৈতে আনন্দরে কোলাকুলি করিছিল অ ঢলা বিছনাত সকলোরে সৈতে বহি আলাপ করিছিল।'
৪/ বাড়িতে কোনো উৎসব বা সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত 'বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী প্রভৃতি লোকসকলক বঙ্গালী নিয়মে ভে াজন করাইছিল।'
৫/ 'ইংরাজী বঙ্গালী আ অসমীয়া তেওঁ ভালিকৈ জানিছিল আ এই ভাষারে গ্রন্থ রচনা করিছিল। ...পূর্বে অসমীয়া মানুহে অসমীয়া মানুহর তালৈ চিঠি লেখিলে বঙ্গালী ভাষারের লেখিছিল। তেওঁ সেইরূপ নকরিছিল, অসমীয়াই বঙ্গালী চিঠি লেখিলেও অসমীয়াকৈ তেওঁ উত্তর দিছিল।'

৬/ 'ফফুকনর অতিশয় উদার ভাব আছিল।... বঙ্গালীসকলকো তেওঁ অপ্রীতি নকিরিছিল। বঙ্গালীবিলাক যে বিজাতীয় আ বিদ্বেষর পাত্র এইটো তেওঁ কেতিয়াও মনত নানিছিল।'

।। গ ।।

'শিল্পী তোর মনত আছিল ন জীবনর ছবি'

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুলাই যজ্ঞরাম ফুকন দেবের (হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের ভাই, আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের কাকা) ইংরেজিতে লেখা কবিতার বাংলা অনুবাদ কলকাতার 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এর দুই বছর আগেই অবশ্য (১৮২৯) হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের বাংলা গদ্য লেখা 'আসাম বুরঞ্জি' প্রকাশিত হয়েছে। অসমের বিদ্য ালয় আদালতে বাংলা ভাষার প্রবর্তন এর অনেক পরের কথা -- সেটা ১৮৩৬ সালে। 'অসমত শাসনযন্ত্র চলাবলৈ ইংর াজরা প্রয়োজন হল দেশীয় লোকর। সেই সুযোগতে বঙ্গালী আমোলা আহি দেশ ভরি পরিল। বঙ্গালী আমোলার প াকচত্রত পরিয়ে ১৮৩৬ খ্রী র পরা অসমর পঢ়াশালী আ আদালতর ভাষা হ'ল বঙ্গলা' (সম্পাদকর নিবেদন / আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনর রচনা সংগ্রহ)।

আনন্দরামের পিতা বাংলাতে 'আসাম বুরঞ্জি' লিখলেও প্রধানত বাঙালিদের কথা মনে রেখেই কয়েকটি বই লিখেছিলেন। অন্ততসে-সব বিষয়ে বাংলা ভাষায় তখনও পর্যন্ত কোনো বই ছিল না। ১৮৫৪ সালে রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠ াকুর কামাখ্যা দর্শনে অসমে এসেছিলেন। এর অন্তত বাইশ বছর আগে (১৮৩১)আনন্দরামের পিতা হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন 'কামাখ্যা যাত্রা পদ্ধতি' নামে সংস্কৃত ভাষায় একটি বই লিখেছিলেন। শুধু তাই নয়, ওই বছরই তাঁর আর একটি বই প্রকাশিত হয়, যেটির নাম 'কামরূপ যাত্রা পদ্ধতি'। ওই একই সময়ে হলিরামের লেখা একটি বাংলা চিঠি কলকাতার 'সম াচার দর্পণ - এ প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর 'কামরূপ যাত্রা পদ্ধতি' বইটি প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে, 'সমাচার - চন্দ্রিকা'অ প্রেস থেকে এ - বইটির প্রকাশের ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী ছিলেনভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উনিশ শতকে অসমের একজন জনপুষ হলিরাম তাঁর 'আসাম বুরঞ্জি' বাংলাভাষায় কেন লিখলেন? 'বঙ্গালী - আমোলা' - দের 'প াকচত্র' - এর (১৮৩৬) সরকারি ষড়যন্ত্রের অন্তত সাতবছর আগের ঘটনা এটি! এই প্রসঙ্গে যুক্তি দিয়েছেন স্বয়ং হলিরাম তাঁর বইয়ের ভূমিকায়। তিনি বলছেন---'...আসাম কামরূপ ইত্যাদি নামে দেশ আছে, ইহাই স্থূলরূপে অনেকের পরিগ্রহ আছে। তাহার বার্ত্তার বিজ্ঞান দূরে থাকুক, সে দেশ কিরূপ, কোনোদিক, তাহা অন্যদেশীয় লোক প্রায় অনেকেই জ্ঞাত নহেন। অতএব আসামের বৃত্তান্ত প্রকাশ করা আবশ্যক। ...সকল লোকের উপকারার্থে আসাম বুরঞ্জি নামক গ্রন্থ অর্থাৎ আসামের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া এইপুস্তক প্রকাশ করিলাম।'

।। ঘ ।।

'তোক চিনা মোর চকু নাছিল সেই দিনা
তোর মরমত গুমরি উঠা নাছিল হবলা মোর বীণা'
আনন্দরাম বয়া (১৮৫০-১৮৮৯)

আমাদের মূল বিষয় উনিশ শতকে অসমিয়া মানুষের বাংলা ভাষা সংস্কৃতি চর্চা তথা অবদান। ১৯২০ সালে সূর্যকুমার ভূঞা আনন্দরাম বয়ার একটি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেন। উক্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ এবং তথ্য অনুসন্ধানে আমাদের প্রধান অবল ম্বন এই বইটি। প্রথমে দেখা যাক আনন্দরাম বয়ার মহত্ব এবং প্রতিভার বিশালত্ব সম্পর্কে একজন কৃতী বাঙালি রাষ্ট্রগু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়নটি। তিনি বলেন, 'As a member of the Indian Civil Service he combined the duties of an administrator with extraordinary devotion to literature, and at the time o his death, I understand, he was engaged in preparing a dictionary (grammar) of the Sanskrit language which, alas, never saw the light. His was a case of blighted promise which in its fruition would have enriched the world of letters'.

সূর্যকুমার ভূঞা যখন আনন্দরাম বয়া জীবনী গ্রন্থটি লিখতে আগ্রহী হলেন তখন তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন আনন্দরাম বয়ার মাস্টারমশাই স্যার গুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়--- '১৯২১ চনর জানুয়ারী মাহর ২৩ তারিখে আমি পূজ্যপাদ

বন্দ্যোপাধ্যায় ডাঙ্গরীয়ার পরা তেওঁর প্রিয়তম শিষ্য মি বয়ার কলেজীয়া জীবনর ঘাই কথাখিনির আভাস পাওঁ। এ ছাড়া কলকাতার অর্থাৎ বঙ্গদেশেরআর একজন বিখ্যাত লোক স্যার তারকনাথ পালিত। এঁর পুত্র লোকেন পালিত বিলেতে রবীন্দ্রনাথের সহপাঠী এবং বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় 'সাহিত্য' পত্রিকায় (১২৯৭) আনন্দরাম বয়ার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন -- যেটির দ্বারা তাঁর জীবনী লেখার সময় সূর্যকুমার ভূঞা প্রভূত সাহায্য পেয়েছিলেন। কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য - পরিষদের সভাকক্ষে এবং নোয়াখালির (বাংলাদেশ) টাউন হলেও আনন্দরাম বয়ার চিত্র স্থা পিত আছে।

শ্রী হেমচন্দ্র গোস্বামী একসময় লিখেছিলেন যে, ইতিহাস আমাদের দর্শনশাস্ত্রের তত্ত্বগুলি দৃষ্টান্ত সহকারে শিক্ষা দেয়, এ-কথা যদি সত্য হয় তবে মহৎ লোকর জীবন চরিত্র অধ্যয়নের মাধ্যমেও আমরা দর্শনশাস্ত্রের তত্ত্ব শিক্ষা করতে পারি 'কিয়নো মহৎ লোকর জীবন - চরিত্রত বুরঞ্জীর একো একোটি অধ্যায় মাথোন। আনন্দরাম বয়ার জীবনর ঘটনাবলী এই দেশত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন, বিস্তার আ তার পরিণীতির উজ্জ্বল উদাহরণ দেখিবলৈ পোয়া যায়। অসমীয়া ডেকার নিমিত্তে আনন্দরাম বয়ার জীবন - চরিত্র যেনেকুয়া শিক্ষার স্থল, আন কোনো জীবন - চরিতেই তেনে শিক্ষার স্থল নহয়।' বাংলার বিখ্যাত যেসব মণীষীরা আনন্দরাম বয়ার এই মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন --- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রমেশচন্দ্র দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন আনন্দরাম, তাঁর সহপাঠী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত। শিক্ষক ছিলেন স্যার গুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বিলেত থেকে সিভিল সার্ভিস পাশ করে তিনি বঙ্গ দেশের নোযাখালি, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা প্রভৃতি অনেক স্থানেই ছিলেন। কুমিল্লার 'বয়াদীঘি' এবং 'বয়াবাজার' --- এই আনন্দরাম বয়ারই নামে। নোয়াখালিতে এই নামে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও আছে। অবশ্য এর বিপরীত ফলও দেখতে পাওয়া যায়। সূর্যকুমার ভূঞা বলছেন --- 'আমার অসমীয়ার মাজত বহুতর আক্ষেপ যে অসমর নিমিত্তে আনন্দরাম একো করি যোরা নাই।' আনন্দরাম বয়ার মৃত্যুর পর এক শোকসভার স্মৃতিচারণ করেছেন উপেন্দ্রনাথ বয়া। সেখানে আরও চাঞ্চল্যকর পরিবেশ --- '...বয়া ডাঙ্গরীয়া ঢুকুয়া বাতরি পাশ শোক - শভা এখন পাঁতিবলৈ আয়োজন করা হৈছিল। কিন্তু সকলোরে কবলৈ ধরিলে যে বয়াদেবে অসমর নিমিত্তে একো করা নাই। তেওঁ বঙ্গলাদেশত আছে, বঙ্গালীককে ভাল পায়। এই বুলি কোয়াত সভা পাতিব পরা নহল।' অবশ্য এর যোগ্য উত্তর আমরা পাই বলিনারায়ণ বরার লেখায়। তিনি বলেন, 'জন্ম অনুসরি মিঃ বয়া এজন অসমীয়া। ...কিন্তু তেওঁক অসমীয়া বোলাটো আ অসমর ক্ষুদ্র রাজ্যর কারণে দাবী করাটো সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক হব। ...বঙ্গই তেওঁক আপোন বুলি বর যত্ন করিছে, কারণ তেওঁ বঙ্গলাদেশও আখে, বঙ্গালীকলে ভাল পায়। এই বুলি কোয়াত সভা পপাতিব পরা নহল।' অবশ্য এর যোগ্য উত্তর আমরা পাই বলিনারায়ণ বরার লেখায়। তিনি বলেন, 'জন্ম অনুসরি মি বয়া এজন অসমীয়া। ...কিন্তু তেওঁক আপোন বুলি বর যত্ন করিছে, কারণ তেওঁ জীবনর সরহখিনি কাম এই বঙ্গদেশত সমাপ্ত করে...।' তাঁর অসমিয়া ভাষা সাহিত্য উন্নয়নী মানসিকতা প্রসঙ্গে সূর্যকুমার ভূঞা যথার্থই বলেছেন--- 'আনন্দরাম বয়াই অসমীয়া সাহিত্যত যোগ নিদিলে সাঁচ, কিন্তু তেওঁঅসমক পাহরা নাছিল। তেওঁর অভিধানর বহুত ঠাইত অসমর উল্লেখ আছে... প্রাচীন কামরূপ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরর করবাত উল্লেখ পালেই তাক তেওঁ মহা আগ্রহেরে ব্যাখ্যা করিছিল...।' সে তো সত্যি কথা। নিজের পরিচয় দিয়ে তিনি যে শ্লোক রচনা করেছিলেন, সেখানেও নিজেকে তিনি বলেছেন--- 'আনন্দরা বয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ্‌পুরসম্ভবঃ।'

এই প্রসঙ্গের ইতি করব একটি অন্য বিষয় দিয়ে। সেটি গীতিকবিতা--- বলা ভালো ক্ষুদ্র অবয়বসংবলিত গান। উনিশ শতকের যে সময়ে আনন্দরাম বয়া নোয়াখালিতে বসে 'আবাহন' নামে বাংলা কবিতা লিখছেন, তত দিনে বাংলা গান তার নিজস্ব পথ খুঁজে পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সে-সময়ে আবির্ভূত। আনন্দরাম বয়ার লেখা ক্ষুদ্র প্রীতিগীতি বা ঈশ্বরের মহিমাসূচক গীতিমালায় রামমোহন রায়, রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু, কালীদাস চট্টোপাধ্যায় বা কালী মির্জা এবং মাইকেল মধূসূদন দত্তের রচনারীতির একটা সাক্ষ্য অনুভব করা যায়। দুয়েকটি উদ্ধৃত করি---

১।।

পেয়ে তোমা আপনার ঘরে
উথলিছে অনিবার, আনন্দের পরিবার,

যেমন উজ্জ্বল সিন্ধু সুধাকর করে,
অথবা দরিদ্রজনে, ধনাঢ্যের আগমনে,
প্রচুর পাইবে ভিক্ষা ভাবিয়া অন্তরে,
সতৃষ্ণ নয়নে থাকে কত আসা করে।

২।।
আমি কাঙ্গালিনী সে প্রকার,
রহিয়াছি করে আশা, হইলে তোমার আসা,
করিবে আমার তুমি কত উপকার,
তাই বলি মতিলান, অধিনীর রেখ মান,
আমার অভাব রাশি নাশিয়ে এবার,
মম সম অভাগিনী নাহি দুটি আর।

আনন্দরাম বয়ার চরিত্র ও প্রতিভার আরেকটি দিক হলো তাঁর সমালোচকের মন এবং বিশ্লেষণী প্রতিভা। একটা সময়ে ইউরোপের পণ্ডিত মহলে ভারতীয় প্রাচীন ভাষা -- সাহিত্যের প্রতি প্রবল আগ্রহ লক্ষ করা যায়। এ - কথা সুবিদিত যে কালিদাসের 'শকুন্তলা' ইউরোপে পণ্ডিত সমাজে কেমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এর মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিত হলেন স্যার ইউলিয়াম জোন্স, ম্যাক্সমুলার প্রমুখ। প্রসঙ্গত বলা যায় ম্যাক্সমুলার আনন্দরাম বয়ার প্রতিভা ও গুণের নানা সময়ে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছিলেন।সে যাইহোক ইউরোপীয় পণ্ডিতদের এই আগ্রহ - প্রবণতা কালে ভারতীয় পণ্ডিতদেরও প্রাচীন ভারতের ভাষা - সাহিত্যের প্রতি নানাভাবে আকর্ষিত করে তুলেছিল। এইভাবে ভারতীয়দের মধ্যে একটি নতুন সমালোচনা পদ্ধতির অবতারণা হয়েছিল। বাংলায় এই বিষয়ে স্মরণীয় হলেন রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ। আনন্দরাম বয়ার প্রতিভা এই ক্ষেত্রে ছিল উচচ শ্রেণীর। তাঁর সমালোচনা পদ্ধতি ছিল ক্ষুরধার যুক্তির উপর আশ্রিত এই প্রসঙ্গে তিনি একটি সংস্কৃত শ্লোকের মমার্থ শিরোধার্য করেছিলেন --- 'যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি/ অন্য তৃণমিব ত্যজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা' (অর্থাৎ 'শিশুর যুক্তিযুক্ত বচন উপাদেয়, কিন্তু অযুক্তিকর বচন পদ্মযোনি ব্রহ্মা বললেও সেটি পরিত্যজ্য')। তাঁর রচিত কয়েকটি বইয়ের উল্লেখ করি--- (১) A practical English – Sanskrit Dictionary (৩ খণ্ড) (২) Higher Sanskrit Grammar : Gender and Syntax (৩) On the Ancient Geography of India : Geographical Names Rendered in Sanskrit (৪) Bhavabhuti's Mahabir Charitam (৫) A Companion to the Sanskrit – Reading under Graduates of the Calcutta University (৬) Bhavabhuti and his place in Sanskrit - Literature (৭) A Comprehensive Grammar of the Sanskrit Language : Analytical, Historical and Lexicographical (৮) A Comprehensive Grammar of the Sanskrit Language : Val X, (৯) Vamana Sutra-vritti (১০) Saraswati-kanthabharana(১১) Dhatu - Vritisara (১২) Amarsingha's Namalinganusasana ইত্যাদি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভবভূতির উত্তরামচরিত এবং বাল্মিকীর রামায়ণ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত রচনার কথা। সে যা হোক আনন্দরাম বয়ার এসব গ্রন্থের নানা প্রশস্তিমূলক আলোচনা - সমালোচনা - সম্বাদ কলকাতার বিশিষ্ট বাংলা পত্র - পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য--- 'সোমপ্রকাশ', 'হিন্দুহিতৈষণী', 'সাহিত্য' ইত্যাদি।
আনন্দরাম বয়া মারা গিয়েছিলেন কলকাতায় স্যার তারকণাথ পালিতের ঘরে --- ১৮৮৯ সালের ১৯ জানুয়ারি। সমস্ত কলকাতায় তাঁর মৃত্যুসংবাদে শোক ছড়িয়ে পড়েছিল। আনন্দরামের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে কলকাতার আর্মহার্স্ট ষ্ট্রিটের জনৈক বাঙালি কাঁদতে - কাঁদতে বলেছিলেন--- '...এয়া এজন ভারতগৌরব মহাপুষ অনন্তনিদ্রাত নিমগ্ন।' আনন্দরাম বয়ার মৃত্যুসংবাদ সেকালের দুটি বিখ্যাত পত্রিকা হিন্দু প্যাট্রিয়ট' ও 'ইন্ডিয়ান মিরর' - এ প্রকাশিত হয়েছিল।
আনন্দরাম বয়ার বিষয়ে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে যে আক্ষেপ এবং মূল্যয়ন করেছিলেন, সেটির অংশ বিশেষ

উদ্ধৃত করেই আলোচ্য নিবন্ধের ইতি টানব। তিনি বলেন--- '...আমাদের মনুষ্য ও মনস্বী ব্যক্তি, আজকাল অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করেন। যদি বা ক্ষণ বা লগ্ন বিশেষে দুই একটি শক্তিশালী লোক, কখনও এই পতিত দেশে জন্মেন, আমরা তাঁহা দিগকে উপেক্ষা করি, তাঁহাদিগকে আমরা চিনিতেই পারি না।...আনন্দরাম বড়ুয়ার ন্যায় ব্যক্তি কি নিত্য নিত্যই এতদ্দেশে জন্মগ্রহণ করেন?

কথা হইতে পারে, বড়ুয়া বাঙ্গালী নহেন, তিনি অপরদেশীয় লোক তা বটে! যে আমরা এখন 'বসুধৈব কুটুম্বকং' বাক্যের বিশেষ চিৎকার করিযা উদার চিত্তের পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক চীনে মার্কিনে সহোদরত্ব সংস্থাপন করিতে দৌড়াইতেছি, সেই আমরাই আবার বড়ুয়াকে বাঙ্গালী নয় বলিয়া বরখস্ত করিতে পারি!!! কিন্তু বাঙ্গালী নহেন কিসে?...আনন্দরাম বড়ুয়া যদি ইংরাজ না হয়েন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই বাঙ্গালী ছিলেন, তাতে সন্দেহ নাই।'

।।ঙ।।

''অ' পৃথিবী কবির কথা কেতিয়া বুজিবি তই?''

সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবয়া সেকালের শিবসাগরের মতো উন্নত শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন বাঙালি শিক্ষকদের কথা বলেছেন। 'সাহিত্যরথী বেজবয়াই তেওঁর মাতৃমুখ দর্শনত শিবসাগর হাইস্কুলর হেডমাস্টার চন্দ্রমোহন গোস্বামী, চেকেন্ড হেডমাস্টর বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী, সংস্কৃত পণ্ডিত প্রসন্নকুমার আচার্যর নাম লৈছিল। শিবসাগর আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয় হেডপণ্ডিত প্রাণকৃষ্ণকরকো সুঁওরিছিল।' এ-প্রসঙ্গে রাগ চলিহা তাঁর 'অণোদইর দিনত শিবসাগর' প্রবন্ধে বলেছেন--- ''শিক্ষার বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে স্কুলর হেডমাস্টার সকলোয়ে বঙালী মানুহ আছিল। ইচিচ্টেন্ট হেডমাস্টার অ া সহকারী শিক্ষকো বহুপরিমাণে বঙালী আছিল...।'

এই প্রসঙ্গে স্বয়ং লক্ষীনাথ বেজয়ার নিজ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ আছে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মোর জীবন সোঁওরণ'-এ। বইটির সাহিত্য একাডেমি বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছে। অনুবাদিকা আরতি ঠাকুর। সে - সময়ে অসমিয়া সমাজে এবং সাধারণ ও বিদ্বৎমণ্ডলীতে বাংলা সংসর্গ কেমন তার একটি ছবি পাওয়া যাবে তেমন কয়েকটি উদ্ধৃতি এক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে।

(ক) 'প্রথমে আমায় বাংলা স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করে দেওয়া হলো। সেই সময়ে অসমীয়ার মাতৃভাষা ছিলে বাংলা; অসমীয়া ভাষাটা যে একটা পৃথক ভাষা নয়, মাত্র বাংলা ভাষারই এক রকমের অশুদ্ধ উচচারণস্বরূপ, এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে গবর্নমেন্ট আসামে অসমীয়া ছেলেদের জন্য 'আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয়' নাম দিয়ে ছাত্রবৃত্তি পাস করার জন্য ব াংলা স্কুল স্থাপন করে দিয়েছিলেন। ...স্কুলের হেডপণ্ডিত এবং দ্বিতীয় ছিলেন বাঙালি... হেডপণ্ডিতের নাম ছিল তারকবাবু (তাঁর উপাধিটা আমি ভুলে গেছি), দ্বিতীয় পণ্ডিতের নাম প্রাণকৃষ্ণ ধর। (দ্রষ্টব্য পরাগ চলিহার প্রবন্ধে বলা হয়েছে 'কর'।) তৃতীয় পণ্ডিত যিনি আমার বাংলা শেখাতেন তাঁর নাম ছিললম্বোদর।...তখনকার কালে অনেক অসমীয়া শূদ্র বামালিদের দেখে নিজেদের নামের পদবীতে দত্ত উপাধি লাগিয়ে নিতেন। তাঁদের মনে এই কথাটা একবারও খেলেনি যে, দাস উপা ধিটা শাস্ত্রমতে চালিয়ে দেওয়া গেলেও, দত্ত উপাধিটা অসমীয়ার পক্ষে একেবারেই অচল। যাহোক কোনো কোনো অসমীয়া তো দত্ত লিখেই সারাটা জীবন চুল - দাড়ি পাকিয়ে কাটিয়ে দিল।...' ইত্যাদি (পৃ ৩১)

(খ) 'তখনকার দিনে বাংলা গান, বাংলা ভাষা, বাঙালির মতো চুলকাটা বা ধুতি চাদর পরাটা একটা ফ্যাশন হয়ে দ াঁড়িয়েছিল। আর যাত্রাগুলোতেও অসমীয়া অঙ্কীয় ভাওনার পরিবর্তে বাঙালি যাত্রাগান দেখান হত। সত্রের মহন্তরা অশুদ্ধ বাংলা ভাষায় নাটক রচনা করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করত ও দর্শককে খুশি করত। মোটের উপর যা কিছু ব াঙালি তা সবই ভাল -- এই ধারণা সবার মনকে খুব প্রভাবান্বিত করেছিল।' (পৃ ২৮)

লক্ষ্মীনাথ বেজবয়া যখন ছোট্টটি তখন শিবসাগরের দুজন ভাইপোর কাছে হেরে গিয়েছিলেন একটি বিষয়ে। সেটি বাংলা কবিতা। ভাইপো দুজন লক্ষ্মীনাথের চেয়ে অনেক বেশি বই পড়েছে...অবস্যি সে-সবই বাংলা বই। ওঁদের বাংলা পদ্য বিদ্যের 'তুবড়িবাজিতে' ওরা আমাকে অবাক করে দিত।' সে-সব কবিতার মধ্যে অনেক - অনেক দিন পরে জীবনস্মৃতি লিখতে গিয়ে লক্ষ্মীনাথ একটি অংশউদ্ধৃত করেছিলেন-- 'পর্বতে ধূসর মেঘ হইল উদয়।/ ভয়ঙ্কর শব্দ করি বেগে বায়ু বয়।।/ পাতা উড়ে ফল পড়ে ভাঙ্গিতেছে ডাল।/ উড়িল বাতাসে সব কুটিরের চাল।/ নদী জলে উঠে ঢেউ পর্বত সমান।/ উপায় না পায় মাঝি করে হায় হায়।।' সে - সময়ে লক্ষ্মীনাথ বেজবয়া একটি সঙ্কল্প করেছিলেন--- '...তখনই আমি মনে

মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, ওদের কাছ থেকে আমি বাংলা শিখে নিয়ে ওদেরই জব্দ করব রীতিমতো। যেমন সঙ্কল্প তেমন কাজ। ওদের কাছ থেকে বাংলা কবিতার বইখানা নিয়ে দুচারদিন পড়ে ওদের মুখস্থ করা কবিতাগুলো আমি মুখস্থ করে নিলাম। তারপর ওরা কবিতা আবৃত্তি করতে শু করলেই আমিও তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমানে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকলে এই কবিতাযুদ্ধ বন্ধ হয়ে শান্তি স্থাপিত হল।' (পৃ ২৭)

লক্ষ্মীনাথ বেজবয়ার দুই দাদা যখন কলকাতায় পড়তে গেলেন তখন লক্ষ্মীনাথ ছোট। তবে একটি কথা তাঁর মনে ছিল, যেটি তিনি পড়ে স্মৃতিচারণায় লিখেছেন--- '...কলকাতায় গিয়ে বাঙালির হাতের রান্না খেলে আমাদের জাত যাবে এই ভয়ে আমাদের বাড়িতেভীষণ সমস্যা দেখা দিয়েছিল...।' (পৃ ১৬) লক্ষ্মীনাথ বেজবয়া পরে বাংলাদেশের সভাগ্রগণ্য পরিবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতেমহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নাতনিকে বিয়ে করেছিলেন, এবং বাংলা ভাষা - সাহিত্যে রীতিমতো গভীর জ্ঞান রাখতেন যদিও, তিনি কিন্তু অসমিয়া ভাষার স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত ঔজ্জ্বল্যের দিকে দৃঢ়-দষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন--- '...ক, খ লিখতে পড়তে শেখার পর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বাংলা শিশুশিক্ষা আমাকে পড়তে দেওয়া হল, কারণ তখনকার দিনের দেশের শাসন কর্তাদের বিপরীত বুদ্ধির ফলে আসামের বিদ্যালয় সমূহে অসমীয়া ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষা শেখানো হত, অস মীয়াদের নিজের মাতৃভাষা জায়গা পেয়েছিল আবর্জনা ফেলা জায়গাতে আর বিদেশিনী বাংলা ভাষা মায়ের স্থান অধিকার করে নিয়ে অসমীয়া শিশুগুলোর মাতৃস্তনের স্থানে 'ফিডিং বটল' দিয়ে তাদের 'কাল কাক ভাল নাক' শিখিয়ে দিয়েছিল। ঈশ্বরের চরণে প্রণাম জানাই যে কালক্রমে দেশ - শাসনকর্তাদের এই ভুল ভাঙল এবং অসমীয়াগণ মাতৃস্তনের স্বাভাবিক ক্ষীরধার পান করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করল। অসমীয়ার মাতৃভাষা বাঙলা নয়, এই সত্য পুনরায় দৃঢ়ভাবে সু-প্রতিষ্ঠিত হল।...' (পৃ ১১)

লক্ষ্মীনাথ বেজবয়া তাঁর জীবনস্মৃতিতে মতিলাল ঘোষ নামে এন্ট্রাস ক্লাসের একজন বাঙালি ছাত্রের স্মৃতিচারণা করেছেন। গোপালচন্দ্র ঘোষ, বিষুঞ্চরণ চক্রবর্তী, শ্রী শ্রীনাথ গুহ প্রমুখ বাঙালি শিক্ষকদের কথাও তাঁর স্মৃতিকথা সূত্রে জানতে পারি। একটি মজার স্মৃতি তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর 'আমার জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে। এটি সেকালের অসমে অসমিয়াদের বাংলা যাত্রা সম্পর্কিত -- অর্থাৎ বাংলা সংস্কৃতি চর্চা প্রয়াসও বলা যেতে পারে। তিনি বলেছেন --- 'বরপেটায় তিথিরাম বাংলা যাত্রাগানের 'পালা' দেখে শিবসাগরের অসমীয়া লোকেদের মধ্যেও যাত্রাগান করার ধুম পড়ে গেল।। ফুকন মত্তানাথ খাজাঞ্চী জামাইবাবুর নেতৃত্বে এবং আরও দুচারজন বাঙালির সাহায্যে রাধার মানভঞ্জনের পালার মহড়া চলতে থাকল। কতগুলো অসমীয়া ছেলেকেও গানের জন্য নেওয়া হল এবং দুচারজন অসমীয়া আধবয়সী ভদ্রলোক দুএকজন বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে বেহালা বাজিয়ে ওস্তাদ হয়ে উঠল। অসমীয়া ছেলেরা যখন 'দেখে যা চন্দ্রাবলী কোন্ধ (কুনু) দুয়ারে (দ্বারে) বনমালী' বলে কোমর নাচিয়ে নাচিয়ে গানের সভায় গাইতে থাকে তখন দর্শকরা আনন্দে আত্মহারা হয়।' (পৃ ৪৭)

লক্ষ্মীনাথ বেজবয়া যখন কলকাতায় সে-সময়ের কথা এই প্রবন্ধেই অন্যপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে। ভবিষ্যৎ অসমের সোনার ছেলেরাতখন কলকাতায় পড়াশোনার জন্য রয়েছে। লক্ষ্মীনাথ ছিলেন ৫৩ নম্বর কলেজ স্ট্রিটের ছাত্রদের মেসে। ১৪/১ প্রতাপচন্দ্র চাটুজ্জে লেনে ছিল অসমিয়া ছাত্রদের মেস। সেখানে থাকতেন সত্যনাথ বরা, দেবীচরণ বয়া, কালীকান্ত বরকাকতী, গোপীনাথ বরদলৈ প্রমুখ। এঁদের সম্পর্কে লক্ষ্মীনাথ বলেছেন ---'আমরা তখন বাংলা পত্রিকার বিদ্যায় পূর্ণ অসমীয়া ছাত্র। আমরা মুখ খুললেই আমাদের বাংলাবিদ্যার জ্ঞান বেরিয়ে পড়ত।' (পৃ ৬২) লক্ষ্মীনাথ বেজবয়া বাংলায় কবিতা লিখেছিলেন--- সেসময় ছদ্মনাম নিয়েছিলেন 'রঙ্গলাল চট্টোপাধ্যায়'।

লক্ষ্মীনাথ বেজবয়ার সঙ্গে বাংলার সম্পর্কের বিষয়টি উনিশ শতকের বাংলা - অসম সম্পর্কের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। একটি মাত্র প্রসঙ্গের কথা বলে এ-বিষয়ে ইতি টানব। লক্ষ্মীনাথ বেজবয়ার বিয়ের জন্য তাঁর পরিবার থেকে দাণ প্রচেষ্টা শু হলো। কিন্তু লক্ষ্মীনাথ বাড়িতে একটি টেলিগ্রাম পাঠালেন--- 'My marriage settled with Maharshi Devendranath Tagore's grand daughter'। এ-বিয়ে হয়েছিল ১৮৯১ সালের ১১ মার্চ। বিয়ের দিনে লক্ষ্মীনাথকে বরণ করার জন্য যে-সব বাংলাগান গাওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে একটি --- 'আয়রে আয় সোনার জামাই/ বরণ করি শাঁখ বাজায়ে/ দেখো যেন যেও নাকো/ ছাদনা তলায় মন হারায়ে।' জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির জামাই লক্ষ্মীনাথ। এই প্রসঙ্গে পরে বলেছেন যে,শ্বশুরবাড়ির লোকেরা অসমিয়া ও বাংলাভাষায় পার্থক্য এবং বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কী রকম অপ্রীতিকর তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতেন। তাঁদের মতে, পূর্ববঙ্গের অপরাপর ভাষা যেমন বাংলা ভাষারই একটা অঙ্গ, অসমিয়া ও

বাংলাভাষার পার্থক্য এবং বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কী রকম অপ্রীতিকর তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতেন। তাঁদের মতে, পূর্ববঙ্গের অপরাপর ভাষা যেমন বাংলা ভাষারই একটা অঙ্গ, অসমিয়া ভাষাও তেমনি। শুধু তাই নয়, তাঁদের দাবি যে লক্ষ্মীনাথের অসমিয়া ভাষা ছেড়ে বাংলা ভাষাতেই সাহিত্যচর্চা করা উচিত এবং সম্পূর্ণরূপে বাঙালি হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু লক্ষ্মীনাথ তাঁদের পুরোপুরি নিরাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন লক্ষ্মীনাথের খুড়শ্বশুর। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্মীনাথের জবানিতেই শোনা যাক--- '...রবিকাকা 'ভারতী' পত্রিকায় অসমীয়া ভাষার উপর মন্তব্য প্রকাশ করে লিখলেন এক প্রবন্ধ। আমি তার প্রতিবাদ লিখে 'ভারতীতে' ছাপাবার জন্য পাঠিয়ে দিলাম।...এরকমভাবে তর্কযুদ্ধের শেষ হল।'

হঠাৎ একদিন কলকাতায় লক্ষ্মীনাথ বেজবয়ার সঙ্গে তাঁর একদা অসমের মাস্টারমশাই চন্দ্রমোহন গোস্বামীর দেখা। পুরনো ছাত্র লক্ষ্মীনাথের যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো, সে - সবও তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে লক্ষ্মীনাথ বেজয়া বিয়ে করেছে, এ-খবর তিনি জানতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লক্ষ্মীনাথকে বলেছিলেন--- 'ঠাকুরবাড়িতে বিয়ে করে তুমি ভালই করেছ। আমি খুবই সুখী হয়েছি। তাঁদের পরিবার বাংলাদেশে খুবই সম্ভ্রান্ত। কিন্তু সেজন্য তুমি তাঁদের কাছে এক চুলও হীনমন্যতা প্রকাশ করোনা, কারণ এইটে মনে রাখবে যে তাঁরা যেমন তাঁদের বংশ গৌরবে বড়, তোমার দেশে তুমিও সেরকম।' (পৃ ৩৬) লক্ষ্মীনাথ এই প্রসঙ্গটি তাঁর জীবনস্মৃতিমূলক গ্রন্থে দুবার উদ্ধৃত করেছেন। শেষে বলেছেন--- 'গুদেবকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রণাম করলাম। উঁচুস্তরের বাঙালির অন্তর কত মহৎ।' (পৃ ৯৩)

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com